بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

আঁ হযরত (সা.)-এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন বদরী সাহাবাকেরাম রেজওয়ানুল্লাহ্ আলাইহিম আজমাঈনদের প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনের বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ হতে প্রদত্ত ৮ই মার্চ ২০১৯-এর খোতবা জুমা এর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

হযরত কায়েস বিন মিহসান একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি আনসারদের বনু যুরায়েক গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদর ও ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেন।

আরেকজন সাহাবী হলেন, হযরত জুবায়ের বিন আইয়ায। তিনি বদরের যুদ্ধে যোগদান করেন। তিনি খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু যুরায়েক এর সদস্য ছিলেন। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর ওপর নাঊযুবিল্লাহ্ কোন ইহুদী জাদু -টোনা করেছিল আর তাঁর (সা.) ওপর এর প্রভাব পড়েছিল। কিছু রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, চিরুনি এবং চুলের ওপর তারা জাদু করে তা উরওয়ান (নামক) কূপে ফেলে দিয়েছিল এবং পরবর্তীতে মহানবী (সা.) সেখানে গিয়ে তা বের করেছিলেন। সহীহ্ বুখারীর শরাহ্ (বা ভাষ্য) ফতহুল বারী-তে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জুবায়ের বিন আইয়্যাস উরওয়ান কূপ থেকে সেই চিরুনি ও চুল তুলে এনেছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত কায়েস বিন মিহসান তা তুলে এনেছিলেন, এ কারণে এই দুই সাহাবীর বিবরণ আমি একত্র করেছি। এই দুইজনের যে-ই সেসব জিনিস তুলে এনে থাকুন, তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। আসল কথা হলো, মহানবী (সা.)-এর ওপর আসলেই কোন জাদুর প্রভাব পড়েছিল কি? আসল ঘটনা কী আর এ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? আর এটি আমাদের জানা থাকা উচিৎ।

হুজুর (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর অসুস্থ হওয়া আর মানুষের এটি মনে করা যে, তাঁর ওপর ইহুদীদের পক্ষ থেকে জাদু-টোনা করা হয়েছে-এ ঘটনাটি যেসব শব্দে বর্ণিত হয়েছে তার বাক্যাবলী সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এর তফসীরের ভূমিকায় অর্থাৎ সূরার ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে যে শব্দমালা লিপিবদ্ধ করেছেন সেগুলো হলো, তিনি লিখেন, তফসীরকারকগণ যেহেতু হযরত আয়েশা (রা.)'র রেওয়ায়েতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন এ জন্য আমরা শুধুমাত্র এই রেওয়ায়েতটির অনুবাদ করছি। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.)-এর ওপর ইহুদীদের পক্ষ থেকে জাদু -টোনা করা হয়েছে আর এর এতটাই প্রভাব পড়েছে যে, তিনি (সা.) অনেক সময় মনে করতেন যে, তিনি অমুক কাজ করেছেন অথচ তিনি সেই কাজ করেন নি। একদিন অথবা এক রাত মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সমীপে দোয়া করেন, আবার দোয়া করেন, পুনরায় দোয়া করেন এরপর বলেন, "হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমি যা চেয়েছিলাম তা তিনি আমাকে দান করেছেন।" হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি যা চেয়েছিলেন তা কী? আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে কী দিয়েছেন? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, "আমার কাছে দু'ব্যক্তি আসে এবং তাদের একজন আমার শিয়রের কাছে বসে আর অপরজন আমার পায়ের কাছে। এরপর সেই ব্যক্তি যে আমার শিয়রের পাশে বসেছিল সে আমার পায়ের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধনপূর্বক বলে অথবা সম্ভবত একথা বলে যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, অথবা একথা বলে যে, পায়ের কাছে বসা ব্যক্তি শিয়রের কাছে উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলে যে, এই ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কী কষ্ট? তখন দ্বিতীয়জন উত্তর দেয় যে, তাকে জাদু-টোনা করা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করে, কে জাদু করেছে? তখন সে উত্তরে বলে, এক ইহুদী লবীদ বিন আসেম করেছে। তখন প্রথমজন বলে, কি দিয়ে জাদু করা হয়েছে? দ্বিতীয়জন উত্তর দেয় যে, চিরুনি এবং মাথার চুল দিয়ে। প্রথমজন জিজ্ঞেস করে, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয়জন বলে, এগুলো উরওয়ান এর কূপের মাঝে রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এরপর তাঁর সাহাদীদের নিয়ে সেই কূপের কাছে যান এবং ফিরে এসে বলেন, হে আয়েশা! আল্লাহ্র কসম! কূপের পানিকে মেহেদীর রসের মত লাল দেখাচ্ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এরপর এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, মনে হয় ইহুদীদের মধ্যে এই প্রচলন ছিল যে, যখন তারা কারো ওপর জাদু -টোনা করতো তখন মেহেদী বা এই ধরনের কোন বস্তু পানিতে মিশিয়ে দিত এটি বুঝানোর জন্য যে, জাদুবলে এই পানিকে লাল করা হয়েছে। এভাবে তারা একটি বাহ্যিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাতো সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! যেগুলোর ওপর জাদু করা হয়েছিল আপনি সেই জিনিসগুলো পুড়িয়ে দিলেন না কেন?

মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন আমাকে আরোগ্য দান করেছেন তখন আমি এমন কোন কাজ করা পছন্দ করি নি যদ্বারা অনিষ্ট মাথাচাড়া দেয়, তাই আমি সেসব বস্তু পুঁতে ফেলার নির্দেশ দিয়েছি, অতএব তা (মাটিতে) পুঁতে ফেলা হয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সারকথা হলো, ইহুদীরা এ বিশ্বাস পোষণ করতো যে, তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর জাদু-টোনা করেছে, এ কারণে স্বভাবতই তাদের মনোযোগ এদিকে নিবদ্ধ থাকে যে, তিনি অসুস্থ হবেন। তিনি (রা.) বলেন, এই রেওয়ায়েত থেকে যেখানে ইহুদিদের সেই শত্রুতার কথা জানা যায় যা মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাদের ছিল, সেখানে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মহানবী (সা.) খোদার সত্য রসূল ছিলেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে সেসব বিষয়ের জ্ঞান দান করা হয়েছে যা ইহুদীরা তাঁর বিরুদ্ধে করছিল। অতএব অদৃশ্যের বিষয়াদি সম্পর্কে তাঁর (সা.) জ্ঞাত হওয়া আর ইহুদীদের নিজেদের দুরভিসন্ধিতে ব্যর্থ হওয়া তাঁর (সা.) সত্য রসূল হওয়ার সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল দলীল। যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যেভাবে এর অর্থ করেছেন সেটিই সঠিক, তা হলো- ইহুদীরা নিজেদের ধারণানুসারে মহানবী (সা.)-এর ওপর জাদু-টোনা করেছিল কিন্তু এর কোন প্রভাব পড়েনি। আর অসুখটি ছিলো বিস্মৃতি রোগ অথবা যে অসুখই হোক না কেন এর অন্য কোন কারণ হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা ইহুদীদের এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে জ্ঞাত করে বাহ্যিকভাবেও তাদের যে ধারণা ছিল যে, তারা জাদু করেছে তারও অপনোদন করেছেন। আর তাঁর (সা.) অসুখ দেখে ইহুদীরা যে নিজেদের ধারণানুসারে আনন্দিত হচ্ছিল বা একথা ছড়াচ্ছিল, অর্থাৎ একথা বলতো যে, আমাদের জাদুর প্রভাবেই এই রোগ দেখা দিয়েছে- এর রহস্যও উন্মোচিত হয়।

মির্যা বশীর আহমদ বলেন, ইতিহাস বরং বিভিন্ন হাদীসে পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর মহানবী (সা.)-এর ওপর (নাঊযুবিল্লাহ্) একবার ইহুদী জাতির এক মুনাফিক লবীদ বিন আসেম জাদু-টোনা করেছিল, আর এই জাদু এভাবে করা হয় যে, একটি চিরুনিতে চুল গিঁট দিয়ে এবং এর ওপর কিছু পড়ে এটিকে একটি কূপের মধ্যে পুঁতে রাখে। তিনি (রা.) বলেন, আর বলা হয় যে, নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি (সা.) দীর্ঘদিন এই জাদু তে আক্রান্ত ছিলেন। তারা এই গুজব রটিয়ে দিয়েছিল। এ সময়কালে তিনি (সা.) অধিকাংশ সময় উদাস এবং মনমরা হয়ে থাকতেন আর শঙ্কিত হয়ে বার বার দোয়া পড়তেন এবং এই অবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকটি ছিল, তাঁকে (সা.) সেই দিনগুলোতে অনেক বেশি বিস্মৃতি রোগে ধরেছিল। তিনি তখন বিভিন্ন জিনিস ভুলে যেতেন, এমনকি অনেক সময় তিনি মনে করতেন যে, আমি অমুক কাজ করে ফেলেছি, কিন্তু আসলে তিনি সেই কাজটি করেন নি। অথবা অনেক সময় তিনি মনে করতেন যে, আমি আমার অমুক স্ত্রীর ঘর থেকে হয়ে এসেছি কিন্তু আসলে তিনি তার ঘরে যান নি। তিনি এর ব্যাখ্যা করেন যে, এ সম্পর্কে এটি স্মরণ রাখতে হবে যে, মহানবী (সা.)-এর রীতি ছিল যে, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তিনি তাঁর স্ত্রী দের জন্য পালা নির্ধারণ করে রেখেছিলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রত্যেক স্ত্রীর ঘরে গিয়ে কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন আর সবশেষে সেই স্ত্রীর ঘরে চলে যেতেন যার সেদিন পালা হতো। উপরোক্ত বর্ণনায় এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যাহোক, এই বিবরণ চলছে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা একটি রুইয়্যা বা সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর কাছে এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পূর্বে যা বর্ণিত হয়েছে এটি তার সারাংশ। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তার বিবরণ বা তফসীরে বুখারীর যে রেওয়ায়েত রয়েছে তার সারাংশ বর্ণনা করেছেন। এরপর তিনি (রা.) লিখেন, এই হলো সেই রেওয়ায়েতের সারাংশ যা ইতিহাস এবং হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এই রেওয়ায়েতকে ঘিরে এমন কল্প-কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে যে, আসল ঘটনা উদ্‌ঘাটন করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। এই রেওয়ায়েত সম্পর্কে এমন এমন আজগুবি গল্প বানানো হয়েছে যে, আসল ঘটনা কি তা জানা কঠিন হয়ে গেছে। তিনি লিখেছেন, যদি এই সব রেওয়ায়েত গ্রহণ করা হয় তাহলে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র এবং কল্যাণময় সত্তা এরূপ প্রমাণিত হয় যেন তিনি একজন দুর্বল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, যাকে নিদেনপক্ষে জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে হলেও তাঁর ঈর্ষাপরায়ণ শত্রুরা স্বীয় জাদুবলে যে ধাঁচে চাইতো গড়তে পারতো, আর এভাবে তারা তাঁকে নিজেদের অপবিত্র মনোযোগের লক্ষ্যে পরিণত করে তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করতো, আর নাঊযুবিল্লাহ্ তিনি এই জাদুর মোকাবিলায় নিজেকে অসহায় অবস্থায়পেতেন। এই রেওয়ায়েতটিকে যদি এভাবে বর্ণনা করা হয় যেভাবে বিভিন্ন হাদীস ও ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তাহলে এমন ফলাফল দাঁড়াবে যা একেবারেই ভুল, এমনটি হতেই পারে না, কিন্তু যদি এসব রেওয়ায়েত সম্পর্কে যুক্তিসম্মত ও যথার্থরূপে চিন্তা করা হয় আর গবেষণাধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়, রীতিমত যদি গবেষণা করা হয় আর অনুসন্ধান করা হয় তাহলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এটি শুধুমাত্র বিস্মৃতির একটি রোগ ছিল, যাতে সাময়িক বিভিন্ন শঙ্কা বা উদ্বেগ এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে কিছু সময়ের জন্য তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন, যাকে কাজে লাগিয়ে কতিপয় পরশ্রীকাতর শত্রু একথা চাউর করে দিয়েছিল যে, আমরা মুসলমানদের নবীর ওপর জাদু করেছি, নাঊযুবিল্লাহ্। কিন্তু খোদা তা'লা মহানবী (সা.)-কে আশু আরোগ্য দান করে শত্রুদের মুখ কালো করে দিয়েছেন আর কপটদের মিথ্যা অপপ্রচারকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন ।

বিশ্বজুড়ে শয়তানী শক্তির ওপর মহান বিজয়ী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, যার চেয়ে বড় তাগুতী বা শয়তানী শক্তিসমূহের মুণ্ডপাতকারী না আজ পর্যন্ত কেউ জন্ম নিয়েছে আর না ভবিষ্যতে কেউ জন্ম নিবে। তাঁর সম্পর্কে এটি মনে করা যে, তিনি এক ইহুদীর শয়তানী জাদুর লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিলেন, এটি মানব-বুদ্ধির চরম অপব্যবহার, এটি চিন্তাও করা যেতে পারে না, আর এটি শুধু আমাদের দাবিই নয়

বরং স্বয়ং বিশ্বজগতের নেতা যার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গীকৃত তিনিও এটি রদ করেছেন। একটি হাদীস দ্বারা(ও) এটি সুস্পষ্ট হয়। হযরত আয়েশা (রা.) নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার সাথে শয়তান আছে কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আছে। অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) তার নিজের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন যে, আমার সাথে শয়তান আছে কি? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আছে। আমি জিজ্ঞেস করি, প্রত্যেক মানুষের সাথেই কি শয়তান লেগে আছে? তখন তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ আছে। হযরত আয়েশা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার সাথেও কি কোন শয়তান লেগে আছে? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, কিন্তু খোদা তা'লা আমাকে শয়তানের ওপর প্রাধান্য দান করেছেন, এমনকি আমার শয়তানও মুসলমান হয়ে গেছে। এরূপ সুস্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল বক্তব্য থাকার পরও কি এই ধারণা করা যেতে পারে যে, কোন কপট ইহুদী, নিজের শয়তানের সাহায্যে মহানবী (সা.)-এর মতো সুমহান মর্যাদার অধিকারীর ওপর জাদু-টোনা করবে আর তিনি সেই শয়তানী জাদু তে প্রভাবিত হয়ে দীর্ঘদিন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, শোকার্ত ও অসুস্থ থাকবেন? তিনি লিখেন, তাহলে প্রশ্ন জাগে যে, সেই ঘটনার বাস্তবতা কী যা সহীহ বুখারীতে পর্যন্ত হযরত আয়েশার বর্ণনায় লিপিবদ্ধ হয়েছে? অতএব যদি ঘটনার পূর্বাপর এবং ইহুদী ও মুনাফেকদের কর্মকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রণিধান করা হয় তাহলে এই ঘটনার বাস্তবতাকে বোঝা বা অনুধাবন করা খুব কঠিন থাকে না। সর্বপ্রথম জেনে রাখা উচিত যে, ধারণাপ্রসূত জাদুর এই ঘটনাটি হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। তাবাকাত ইবনে সাদ-এ এটি লেখা আছে, যাতে মহানবী (সা.) একটি স্বপ্নের ভিত্তিতেওমরার উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এ উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু পথিমধ্যে কুরাইশদের বাধা দেয়ার কারণে বাহ্যত বিফল হয়ে ফিরতে হয়। এই আপাত ব্যর্থতা এমন এক আঘাত ছিল যার কারণে কাফের এবং মুনাফেকদের পক্ষ থেকে তো হাসিঠাট্টা এবং বিদ্রুপ ও কটাক্ষ করারই ছিল, কিন্তু কতিপয় নিষ্ঠাবান মুসলমান, এমনকি একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.) এর মতো উন্নত পর্যায়ের বুযুর্গও এই আপাত ব্যর্থতার কারণে সাময়িকভাবে দোদুল্যমান হয়ে পড়েছিলেন। এসব পরিস্থিতির ফলে দুর্বল চিত্তের লোকদের পরীক্ষায় নিপতিত হওয়ার দুশ্চিন্তায় মহানবী (সা.) এর ওপর স্বভাবতই মানসিক চাপ ছিল এবং কিছুকাল পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। এর আবশ্যিক প্রভাব তাঁর (সা.) স্বাস্থ্যের ওপরও পড়েছে। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এই ফলাফল বের করেছেন যে, তা কয়েক দিনের জন্য ছিল আর এর কারণ ছিল সেই দুশ্চিন্তা যা মুসলমানদের ঈমানে দুর্বলতার আশঙ্কার কারণে তাঁর (সা.) ছিল, এটি এক আবশ্যকীয় মানবিক দিক যা থেকে খোদার নবীরাও মুক্ত নন। ইহুদী এবং মুনাফেকরা যখন এটি দেখে যে, মহানবী (সা.) আজকাল অসুস্থ আছেন আর স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের দুর্বলতার কারণে তিনি আবশ্যিকভাবে বিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত, তখন তারা অভ্যাস অনুযায়ী নৈরাজ্যের উদ্দেশ্যে এ কথা প্রচার করা আরম্ভ করে যে, আমরা নাঊযুবিল্লাহ্‌ মুসলমানদের নবীর ওপর জাদু-টোনা করেছি, আর তাঁর এই বিস্মৃতির রোগ সেই জাদুরই ফলাফল। সেইসাথে তারা তাদের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী বাহ্যিক আলামত বা নিদর্শন হিসেবে কোন চিরুনিতে চুলের গিট ইত্যাদি দিয়ে একটি কুয়ায় তা পুঁতে রাখে।

তাদের এই ধারণাপ্রসূত জাদুর সংবাদ যখন মহানবী (সা.) এর কাছে পৌঁছে, তখন তিনি এই নৈরাজ্যকে প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ্‌ তা'লার কাছে আরো দোয়া করেন। অতএব আল্লাহ্‌ তা'লা তাঁর ব্যকুলচিত্তের দোয়াসমূহ গ্রহণ করেন আর স্বপ্নের মাধ্যমে তাঁর কাছে এর প্রকৃত বিষয় উন্মোচন করেন। পবিত্র কুরআনের নীতিগত ঘোষণা যে, لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى(সূরা তাহা: ৭০) অর্থাৎ নবীদের বিপরীতে কোন জাদুকর কোন পরিস্থিতিতেই সফল হতে পারে না, তা সে যেভাবে আর যে দিক থেকেই হামলা করুক না কেন। তাছাড়া পবিত্র কুরআনের এই অকাট্য সিদ্ধান্তের আলোকে যে, يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا অর্থাৎ যালেমরা বলে যে, তোমরা কেবল এমন একজনের অনুবর্তীতা করছ যে জাদুগ্রস্ত। হুজুর (আই.) বলেন, হাদীসের শব্দ ও বর্ণনা পদ্ধতি এবং আরবী পরিভাষার প্রতি প্রণিধান করলে বুখারীর এই বর্ণনাটি নিশ্চিতভাবে **'হাকায়েত আনিল গায়র'** রূপে ধরে নিতে হবে যেখানে 'হাকায়েত আনিল গায়র'-এর অর্থ হলো বাহ্যত বক্তা নিজের পক্ষ থেকে কথা বললেও এর প্রকৃত অর্থ এটি হয়ে থাকে যে, অন্যরা এই কথা বলে, অর্থাৎ অপরের কথা বর্ণনা করা হয়। এভাবে এই রেওয়ায়েত যে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.) এর ওপর জাদু-টোনা করা হয়- এর অর্থ হলো, শত্রুরা এ কথা প্রচার করেছে যে, তাঁর (সা.) ওপর জাদু-টোনা করা হয়েছে, হযরত আয়েশা নিজে এ কথা বলেন নি। অর্থাৎ এর অনুবাদ হবে যে, শত্রুরা এ কথা প্রচার করেছে যে, তাঁর (সা.) ওপর জাদু করা হয়েছে। এমনকি সেই দিনগুলোতে তিনি (সা.) অনেক সময় এটি মনে করতেন যে, তিনি অমুক কাজ করেছেন অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেন নি।

আঁ হযরত (সা.) আল্লাহর নিকট দোয়া করেন। আল্লাহ তা'লা তাঁকে স্বপ্নের মাধ্যমে অবহিত করেন যে দুইজন ব্যক্তি তাঁর কষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করছে। ঐ স্বপ্নে তিনি জানতে পারেন কোন ইহুদী নিজেদেরে ধারণা অনুযায়ী তাঁর ওপর জাদু করার জন্য কোন জিনিস কোন কুঁয়োর মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তিনি (সা.) নিজের কতিপয় সাহাবীর সাথে সেই কুয়ার কাছে যান এবং তা বন্ধ করিয়ে দেন। বলছে। হযরত আয়েশা বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর কাছে নিবেদন করি যে, আপনি সেই চিরুনি ইত্যাদি বাইরে বের করে ফেলে দেননি কেন? তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্‌ তা'লা আমাকে নিরাপদ রেখেছেন এবংআরোগ্য দান করেছেন,তাহলে আমি তা বাইরে নিক্ষেপ করে একটি মন্দ বিষয়কে কেন প্রচার করব যার কারণে দুর্বল চিত্তের মানুষের মাঝে অযথা জাদুর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হবে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, স্বপ্নের আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য এটি ছাড়া আর কিছু ছিল না যে, এই কুচক্রীরা সেই কূপে যে জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল এবং যার মাধ্যমে তারা নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের প্রতারিত করত, অর্থাৎ তারা যে নিজেদের মতো করে লোকদের ধোকা দিচ্ছিল এবং মিথ্যা প্রচার করছিল আর মুনাফেকদের মাঝে মিথ্যাচার করছিল, সেটি যেন আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় রসূলের কাছে প্রকাশিত করে দেন, যেন তাদের ধারণা প্রসূত জাদুকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়। অতএব এমনটিই হয়েছে, তাদের জাদুর জন্য ব্যবহৃত হাতিয়ারকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে আর সেই কূপটি মাটি ফেলে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে আর এর আবশ্যিক ফলাফল রূপে মহানবী (সা.) এর এই প্রকৃতিগত দুশ্চিন্তাও দূর হয়ে যায় যে, দুষ্কৃ তিপরায়ণরা এরূপ দুষ্টামি করে সরল প্রকৃতির লোকদের ধোঁকা দিতে চায়। আর এই ঐশী প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত প্রতাপের সাথে পূর্ণ হয় যে, لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى এক জাদুকর যে পথই অবলম্বন করুক না কেন, সে খোদার এক নবীর মোকাবেলায় কখনো সফল হতে পারবে না।

অবশেষে এই প্রশ্ন থেকেই যায় যে, মহানবী (সা.), যিনি খোদা তা'লার এক মহামর্যাদাবান নবী বরং সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং খাতামান্নাবীঈন ছিলেন, তিনি বিস্মৃতির রোগে কেন আক্রান্ত হলেন, যা বাহ্যত নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। এই প্রশ্নের উত্তরে ভালোভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক নবীর দুই প্রকার ব্যক্তিত্ব থাকে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি খোদার নবী এবং রসূল হয়ে থাকেন, যার কারণে তিনি খোদার বাণী লাভের সম্মানে সম্মানীত হন, আর ধর্মীয় বিষয়াদিতে নিজ অনুসারীদের উস্তাদ বা শিক্ষক আখ্যায়িত হন এবং তাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ হন। আর অপর দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি মানুষের মাঝ থেকে কেবল একজন মানুষই হয়ে থাকেন। আর সকল প্রকার মানবিক চাহিদা ও প্রকৃতিগত বিপদের অধীনস্ত হয়ে থাকেন যা অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, যদি এখানে কারো এই ধারণা জাগে যে, পবিত্র কুরআন তো মহানবী (সা.) সম্পর্কে ঘোষণা করেছে যে, سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى (সূরা আলা : ৭)। অর্থাৎ আমরা তোমাকে এমন এক শিক্ষা প্রদান করব যা তুমি বিস্মৃত হবে না। স্মরণ রাখা উচিত যে, এই প্রতিশ্রুতি কেবল কুরআনী ওহী সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে, সাধারণভাবে নয়। এই প্রতিশ্রুতি সাধারণ দৈনন্দিন বিষয়াদি আর জাগতিক কাজকর্ম অথবা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক রীতিনীতি সম্পর্কে মোটেই নয়। অতএব হাদীস থেকেও প্রমাণিত যে, তিনি (সা.) কখনো কখনো মানবীয় দুর্বলতার কারণে ভুলে যেতেন। বরং হাদীসে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি কখনো কখনো নামায পড়ানোর সময় রাকাতের সংখ্যা ভুলে যান আর মানুষ তাকে স্মরণ করানোর পর তার স্মরণ হয়। সুতরাং যেভাবে মহানবী (সা.) এর কখনো কখনো সাধারণ ও সাময়িক বিস্মৃতি হতো, অনুরূপভাবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কিছু সময়ের জন্য তিনি বিস্মৃতির রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। আর পূর্বের ওলামগণও একথা বলেন যে, মহানবী (সা.) এর এই যে সাময়িক বিস্মৃতির রোগ হয়েছিল তা রোগ সমূহের মাঝে একটি রোগ ছিল মাত্র, যেমনটি হাদীসের শেষ শব্দাবলী থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আরোগ্য দান করেছেন।

হুজুর আনোয়ার (আই.) বলেন, পরিশেষে যুগের হাকাম এবং আদাল এর এ সম্পর্কিত উদ্বৃতি পাঠ করছি যা সকল ব্যাখ্যা এবং বর্ণনাকে ঘিরে আছে। এক ব্যক্তি তাঁর (আ.) বৈঠকে প্রশ্ন করে যে, মহানবী (সা.) এর ওপর কাফেররা যে জাদু করেছিল সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, জাদুও শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। রসূল এবং নবীদের মর্যাদা এমন নয় যে, তাদের ওপর জাদুর কোন প্রভাব পড়তে পারে। বরং তাদেরকে দেখে জাদু পলায়ন করে। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى এ কথা সম্পূর্ণ ভুল যে, মহানবী (সা.) এর বিপরীতে জাদু প্রাধান্য লাভ করেছে। আমরা কখনো এটি গ্রহণ করতে পারি না। চোখ বন্ধ করে বুখারী এবং মুসলিমকে গ্রহণ করে নেওয়া আমাদের রীতি পরিপন্থী। এটি তো মানুষের বিবেকও গ্রহণ করবে না যে, এমন উন্নত পর্যায়ের নবীর ওপর জাদুর প্রভাব পড়েছে। এই জাদুর প্রভাবে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.) এর স্মরণশক্তি লোপ পেয়েছিল, আর এটি হয়েছিল, সেটি হয়েছিল- এসব কথা কোন ক্রমেই সঠিক হতে পারে না। তারা এতটুকুও চিন্তা করে না যে, নাঊযুবিল্লাহ্, মহানবী (সা.) এর যদি এই অবস্থা হয় তাহলে তাঁর উম্মতের কী অবস্থা হবে? তারা তো তাহলে পুরোপুরি নিমজ্জিত হবে। জানি না এদের কী হয়েছে, যে নিষ্পাপ নবী (সা.) কে সকল নবীগণ শয়তানের স্পর্শ থেকে পবিত্র মনে করে আসছে, তারা তাঁর (সা.) নামে এমনসব কথা বলে! আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা যুগ ইমামকে মানার কারণে মহানবী (সা.) এর মাকাম এবং মর্যাদাকে জানি এবং অনুধাবন করি।

Khulasa Khutba (Bangla) Huzoor Anwar (atba) 8th March 2019

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B